গানের মহাজন উকিল মুন্সি

অলকানন্দা মালা

একবার এক বাউলের নামে মসজিদে গান করার অভিযোগ নিয়ে থানায় নালিশ জানায় এক ব্যক্তি। তদন্ত করতে আসেন এক পুলিশ কর্মকর্তা। কিন্তু হয় উল্টো। বাউলের পরনে ধবধবে সাদা লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি। কণ্ঠস্বর দরাজ। সুঠামদেহী লম্বা-চওড়া ফর্সা অবয়ব দেখে সে বাউলের ভক্ত বনে যান তদন্ত কর্মকর্তা। বাউলের ভক্ত শুধু ওই পুলিশ কর্মকর্তাই নন। বিশ্বের আনাচ-কানাচে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষীদের হৃদয়ে তার জন্য রয়েছে উচ্চ আসন। 'আমার গায়ে যত দুঃখ সয় বন্ধুয়ারে, কর তোমার মনে যাহা লয়', 'পূবালী বাতাসে বাদাম দেইখা চাইয়া থাকি, আমার নি কেউ আসে' এমন গানের শিল্পী এই বাউল। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কার কথা বলছি। তিনি উকিল মুন্সি, শেকড়ের ঘ্রাণযুক্ত অসংখ্য বাংলা গানের মহাজন।

বেতাই নদীর তীরে জন্ম

নেত্রকোনার সন্তান উকিল মুন্সি। ১৮৮৫ সালে জেলাটির মোহনগঞ্জ উপজেলায় বেতাই নদীর তীরে অবস্থিত জৈনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার বাবা গোলাম রসুল আকন্দ ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তি ছিল তার। উকিল মুন্সির পারিবারিক নাম আব্দুল হক আকন্দ। আব্দুল হক আকন্দের জীবন ছিল বেতাই নদীর মতোই বৈচিত্র্যময়। বাঁক বদলের সাথে সাথে জেগেছে চর আবার কখনও ভেঙেছে ঘর। ছোটবেলায় বেশ আদরে ছিলেন উকিল। তবে বেশিদিন সে আদর কপালে সয়নি। ধনীর ছেলে হওয়া সত্ত্বেও বালক বয়সেই পড়েন চরম দারিদ্র্যে। শুরুটা হয়েছিল বাবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বয়স যখন ১০ তখন মারা যান তার পিতা। এর কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে করে উকিলকে ত্যাগ করেন তার মা। বাবা-মা দুজনকেই হারিয়ে হাবুডুবু খেতে থাকেন বালক উকিল। অনেকটা বাধ্য হয়েই মাথা গোঁজেন মায়ের নতুন সংসারে। তবে সে

সংসারে কদর পাননি উকিল। ততদিনে মায়ের কোল জুড়ে এসেছে আরেক সন্তান। নিজের ছেলের যত্ন কম হবে বলে উকিলকে সহ্য করতে পারতেন না সৎ বাবা। এ অবস্থায় উকিল ছিলেন অনেকটা বোঝা। এরই মঝে ত্যাগ করেন মায়ের সংসার।

যে ডালে বসেছেন সে ডালই ভেঙেছে

মায়ের ঘর ত্যাগ করার পর আর আদর মেলেনি কোথাও। কোনো ডালই পাখি হয়ে বসার সুযোগ দেয়নি ছোট্ট উকিলকে। যখনই যে ডালে বসেছেন হয় ভেঙে গেছে না হয় ঝড় উঠেছে। মায়ের সঙ্গ ত্যাগ করে অনাদরে অনাহারে দিন কাটতে থাকে উকিলের। ভাইয়ের ছেলের এমন দুর্দশা সইতে পারেননি ফুপু। জায়গা দেন নিজের সংসারে। তবে সে সংসারও বিষ ছিল তার জন্য। ফুফু গ্রহণ করলেও অনীহা ছিল তার স্বামীর। তাই বেশিদিন ঠাঁই হয়নি সেখানে। ফুপুর ঘর ছেড়ে ফের রাস্তায় নামেন উকিল। ফিরে আসেন নিজ গ্রামে। ততদিনে কেটে গেছে অনেক সময়। উকিল তখন ১৮/১৯ বছরের তরুণ। অভাব অনটন অবহেলা ছিল নিত্যসঙ্গী। তাই পড়ালেখা করাও খুব একটা হয়ে ওঠেনি।

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

তিন কূলে কেউ না থাকায় শাসন করারও কেউ ছিল না। পেয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা। এ সময়ই সংগীতের বীজ বপন হয় উকিলের হৃদয়ে। সে সময় গ্রামগঞ্জে বাড়িতে বাড়িতে ঘাটু গানের আসর বসানো হতো। উকিল মুন্সি ছিলেন তার নিয়মিত শ্রোতা। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেসব গান শুনতেন। শুনতে শুনতেই ভাব আসে উকিলের ভেতর। সিদ্ধান্ত নেন তিনিও ঘাটু গাইবেন। পরে নিজেই গান লেখা শুরু করেন। কণ্ঠে সুর ছিল। দরাজ গলায় ছিল মাধুর্য। ফলে বেশিদিন লাগেনি নাম কুড়াতে। অল্পদিনেই দশদিকে সুনাম ছড়িয়ে যায় ঘাটু রচিয়তা ও গায়ক হিসেবে।

যখনই বেঁধেছেন ঘর তখনই উঠেছে ঝড়

গায়ক উকিলের সুনাম কানে যায় মোহনগঞ্জ উপজেলার জালালপুর গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির। সম্পর্কে তিনি চাচা হতেন। উকিলের গান তারও হৃদয় নাড়িয়ে দেয়। বুকে টেনে নেন ভাইয়ের ছেলেকে। আজন্ম অবহেলিত উকিল ছিলেন আদরের কাঙাল। বয়স যখন ২১/২২ তখন চলে যান চাচার ডেরায়। চাচার ঘরে বাসা বেঁধে ঘুরে ফিরে গান করেই দিন কাটছিল তরুণ উকিলের। তবে সুখের সঙ্গে ঘর বাঁধা যেন তার জন্য ছিল প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এবার ভাব করেন হৃদয়ের তাড়নায়। এর পেছনে ছিলেন হামিদা আক্তার খাতুন নামের এক তরুণী। চাচার গায়ের দরিদ্র লবু হোসেনের মেয়ে হামিদার সৌন্দর্যে বিমোহিত হন উকিল। বাঁধা পড়েন সম্পর্কের সুতায়। তাদের প্রেমের খবর রাষ্ট্র হতে সময় নেয়নি। বিপত্তিটা বাধে সেখানেই। গরিব ঘরের হামিদার সঙ্গে ভাইয়ের ছেলের সম্পর্ক মানতে নারাজ উকিলের চাচা। উকিলের ওপরও হন ক্ষুব্ধ। বাড়ি থেকে বের করে দেন। জালালপুর গ্রামে যেন আর ঢুকতে না পারেন সে হুকুমও দিয়ে দেন সাগরেদদের।

উকিল ফিরে আসেন নিজ গায়ে। তবে হৃদয় পড়ে থাকে লবু নন্দিনীর কাছে। প্রিয়তমার বিরহে ঘুরতে থাকেন পাগলের মতো। এরইমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন একমাত্র ছোট ভাই আব্দুল মজিদ আকন্দ। শেষ স্বজনের বিদায় ও প্রেয়সীর বিরহ জগতের প্রতি মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় উকিলের। মোহনগঞ্জের জৈনপুর, পাগলাজোর, শ্যামপুর, আটবাড়িতে পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে দিনযাপন করতে থাকেন। জীবনধারনের জন্য জলের দামে বেচতে থাকেন পিতার সম্পত্তি। রাজার ভান্ডার শুয়ে বসে খেলে ফুরাতে সময় লাগে না। উকিলেরও তাই হয়। বয়স যখন ৩০ বছর, তখন ইমামতি ও ছেলেমেয়েদের আরবি পড়ানো শুরু করেন তিনি। পাশাপাশি গজল রচনা করতেন এবং উচ্চস্বরে সুমধুর কণ্ঠে গাইতেন। গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ শেষে তিনি সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন ও গজল গাইতেন। এভাবেই রাত পার করে দিতেন।

শান্তি মিলেছিল হামিদার আঁচলে

চলুন দেখে আসি কেমন কাটছে উকিলের প্রেমিকা হামিদার দিন। তিনিও কাতর ছিলেন প্রেমিকের শোকে। চোখের জলে দিন কাটাতেন। সে কান্না সইতে পারেননি লবু হোসেন। সিদ্ধান্ত নেন উকিলের ঘরেই পাঠাবেন মেয়েকে। মুরুব্বী ছাড়াও পাত্রস্থ না করার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে পথে নামেন উকিলের খোঁজে। এরপরের গল্পটা মিলনের। হামিদাকে বিয়ে করে শশুর বাড়িতেই সংসার পাতেন বাউল। মনের মানুষকে পাশে পেয়ে সৃষ্টিশীল সত্তা যেন আরও চাঙা হয়ে ওঠে। একের পর এক গান গজল রচনা করতে থাকেন।

আধ্যাত্মবাদ ও সংগীত

এ সময় উকিল শিষত্ব গ্রহণ করেন পীর মোজাফফর আহমেদ রহমাতুল্লাহ আলাইহির। ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে উকিল মুন্সির নাম। তার গান ও গজলে মজে যায় চারপাশের মানুষজন। ফলে কুলিয়াটি গ্রামে তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে আখড়া। ধীরে ধীরে তা হয়ে ওঠে বাউলদের তীর্থস্থান। তার ভক্তদের মধ্যে হৃদয় সরকার, আব্দুল জলিল, ঢালাই খাঁ, আবু চান ছিলেন অন্যতম। ক্রমশ এই তালিকা বড় হতে থাকে। মাঝে মাঝেই আখড়ায় উকিলের নেতৃত্বে মজমা বসতো দেহতত্ত্ব গুরুতত্ত্ব লোকতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্বের গানের। সেখানে বেশিরভাগই থাকতো উকিলের নিজের লেখা গান।

যেখানে ব্যতিক্রম উকিল

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাউলদের সঙ্গে শরীয়তপন্থীদের চিরশত্রুতা থাকে। বাউল সম্রাট আব্দুল করিমসহ অনেককেই এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। তবে উকিল ছিলেন এর ব্যতিক্রম। শরীয়তপন্থীরাও মান্য করতেন তাকে। উকিল নিজেও ইমামতি করতেন, নামাজ পড়াতেন। অনেকেই মৃত্যুর সময় ওছিয়ত করে যেতেন তার জানাজার নামাজ যেন উকিল মুন্সি পড়ান। এমন অনেক হয়েছে গানের আসরে দাঁড়িয়ে গেছেন উকিল। খবর এসেছে কারও মৃত্যুর। জানাজা পড়াতে ডাক পড়েছে তার। হাতের একতারা নামিয়ে ছুটে গেছেন। কুলিয়াটি গ্রামের অনেকে ভক্ত ছিলেন উকিলের। গানের আসরে যেমন একতারা হাতে নেতৃত্ব দিতেন। তার মরমী সুরে কেঁদে বুক ভাসাতেন শ্রোতারা। তেমনই মাহফিলে সকলের হয়ে দুহাত তুলে মোনাজাত ধরতে হতো তাকে। তার হৃদয়স্পর্শী আহাজারিতে কেঁদে আকুল হতো সবাই।

অসংখ্য গানের মহাজন

একজীবনে অসংখ্য জনপ্রিয় গানের মহাজন উকিল মুন্সি। তার গানে যেমন উঠে এসেছে বিরহী প্রেমিকের আর্তনাদ, ঘাটে বসে থাকা কুলবধুর আহাজারি; তেমনই উঠে এসেছে মথুরা বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদি চরণ। এ কারণে অনেকেই তাকে বিরহী বাউল বলে ডাকতেন। উকিল মুন্সি রচিত জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে ‘আমার গায়ে যত দুঃখ সয় আষাঢ় মাইসা ভাষা পানি নিন্দুয়া বাতাসে পিরিত কইরা আমার সুখ হইল না’ প্রভৃতি অন্যতম। তবে কোনো গান বইবন্দি করা হয়নি উকিলের।

শেষ বয়সে দুঃখের অসুখ

আজন্ম দুঃখের সঙ্গে ঘর করেছেন উকিল মুন্সি। বিবাহিত জীবনে সুখি ছিলেন। তবে শেষ জীবনে ভুগতে হয়েছে দুঃখের অসুখে। উকিল মুন্সির ছেলে সাত্তার বাউল বাবার মতোই প্রতিভাবান ছিলেন। একই আসরে একতারা বাজিয়ে গাইতেন বাপ-ছেলে। তবে জীবন খুব একটা দীর্ঘ ছিল না তার। ১৯৭৮ সালে কোনো এক গানের আসর থেকে পিতা পুত্র একসঙ্গেই ফিরছিলেন। পথিমধ্যে জ্বরে আক্রান্ত হন সাত্তার। আর সেরে উঠেননি। কয়েকদিনের মধ্যেই পাড়ি জমান পরপারে। এই বিরহ মেনে নিতে পারেননি বাউল। পুত্রশোক পাগল করে দিয়েছিল তাকে। মৃত সাত্তারের বিচ্ছেদে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর স্বাভাবিক জীবনে ফেরা হয়নি। সন্তানের মৃত্যুর বছরই ১২ ডিসেম্বর স্রষ্টার কাছে চলে যান তিনি। ছেলের পাশেই দাফন করা হয় তাকে।

আব্দুল হক থেকে উকিল মুন্সি

বাবা-মায়ের ইচ্ছা ছিল ছেলে আব্দুল হক আকন্দ বড় হয়ে উকিল হবেন। সেকারণে আদর করে উকিল বলেই ডাকতেন শৈশবে। কিন্তু জীবন তাকে আদালতের চৌহদ্দিতে নেওয়ার বদলে নিয়ে যায় সংগীতের ভুবনে। ততদিনে চেনাজানাদের মাঝে উকিল নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছেন আব্দুল হক আকন্দ। নামের শেষে মুন্সি যোগের রয়েছে আলাদা গল্প। এক সময় কোরআন পড়াতেন, করতেন মসজিদে ইমামতি। ওই সময় নামের সঙ্গে মুন্সি যোগ হয় তার। এভাবেই আব্দুল হক আকন্দ হয়ে ওঠেন বাংলা গানের বিখ্যাত মহাজন বাউল উকিল মুন্সি।